www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

শাস্ত্রজাতক

বাণী বসু

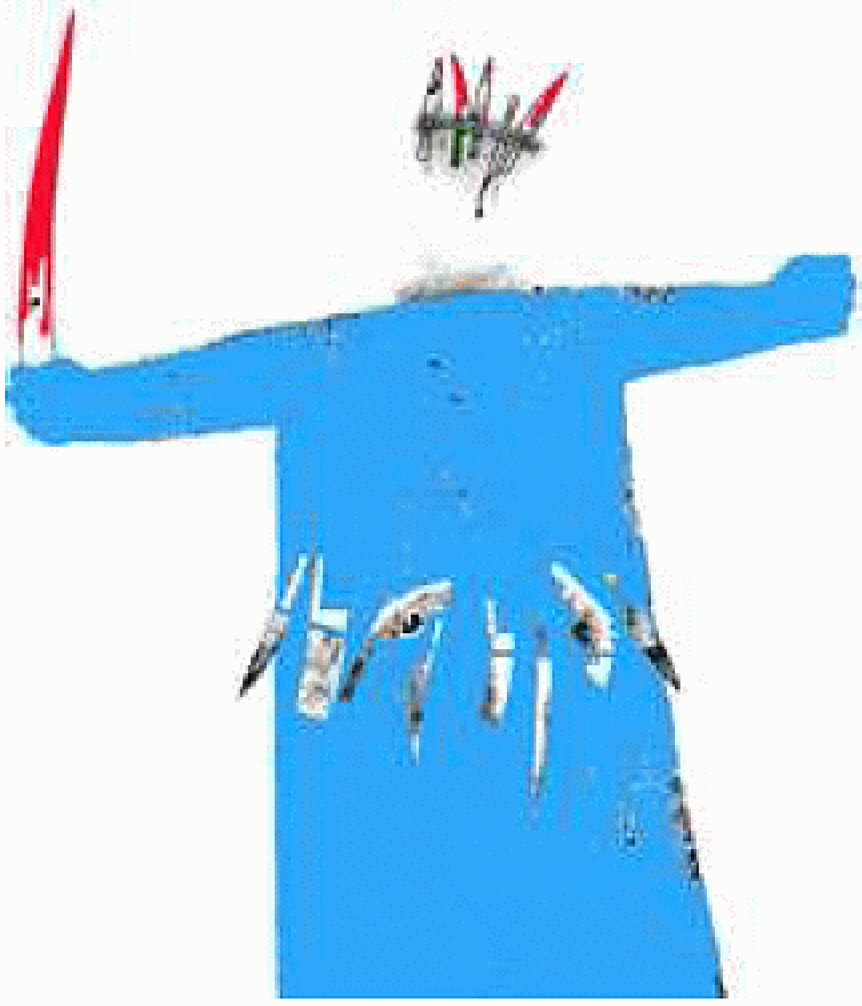

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে জন্ম হল। কিন্তু জন্ম থেকেই লোকটির নানা রকম গণ্ডগোল ছিল। চোখ রয়েছে, যেন কাচের মতো, কিছু দেখতে পাচ্ছে কি না, কতটুকুই বা দেখছে, বোঝা যেত না। কান রয়েছে খাড়াখাড়া, কিন্তু কোন শব্দতরঙ্গে যে সাড়া দেয় বোঝা ভার। পিঁপড়ের স্বর, না কি ব্যাঘ্রগর্জন? কী শোনে আর কতটুকু শোনে ভগবান জানেন। জিভে তার স্বাদকুঁড়িগুলোই বা ঠিকঠাক ব্যবহার করে কই? ঝাল তার মিষ্টি লাগে, চোখ বুজে আহ্লাদ প্রকাশ করে, মিষ্টি দাও, তেতো বলে থুঃ থুঃ করে ফেলে দেবে। নুনে খরে গেছে ব্যঞ্জন, দিব্যি সাপসুপ খেয়ে নিচ্ছে। অথচ তুমি সঠিক লবণ, মিষ্টি, সঠিক ঝাল সাব্যস্ত সুন্দর পদ করে দাও, সে মুখ বিকৃত করে চলে যাবে। ধাত্রীরা বলাবলি করে জন্ম তো হল চেষ্টা-চরিত্র করে, কিন্তু এর কোথাও কিছু গুলিয়ে গেছে, ইন্দ্রিয়গুলো ঠিকঠাক বলছে না। তা সে যাই হোক, অনুষ্ঠানাদি ও লালন-পালন তো যথাযথ করতেই হয়। পণ্ডিতমশাইরা ঠিক সময়ে হাতেখড়ি দিয়ে তাকে শব্দব্রহ্মে দীক্ষিত করলেন, তার মুখ দিয়ে অর্ধব্যক্ত একটা আওয়াজ বার হল। পৃথিবীর আদিতম সহজতম ওম্-ধ্বনি সে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারল না। বেরোল যা তাকে বড় জোর বলা চলে পশুবৎ হুঙ্কার। সে হুঙ্কারে শতহস্ত দূরে সরে গেলেন পণ্ডিতরা— “বাপ রে, এ কী প’ড়ো!”

তবু চেষ্টার অন্ত নেই। এত কষ্টের এত গণনার শুভজন্ম! শেখানো, লেখানো, আত্মস্থ করা, আঁক কষা, যা কিছু শিক্ষার অঙ্গ, শ্রুতির, স্মৃতির ও প্রয়োগের, সবই ধৈর্য ধরে চলল, পণ্ডিতরা তো আর যে সে পণ্ডিত নন। বিশ্ববিদ্যার সার যাঁরা জানেন, লোকবিশ্রুত সেই তাঁরাই। তার পর সে কী শিখেছে তার পরীক্ষা হল। পরীক্ষার ফল বড় ভয়াবহ।

লিখেছে, অ-য়ে অহং, আ-য়ে আমি, হ্রস্ব ই-তে ইল্লি, দীর্ঘ ঈ-তে ঈর্ষা, ঋ-তে ঋষ্টি, হ্রস্ব উ-তে উৎকট, ঊ-তে ঊষর, এ-তে একাধিকবার, ঐ-তে ঐকপত্য, ও-তে ওজর, ঔ-তে ঔদরিক। মাথায় হাত পণ্ডিতদের। বুদ্ধি নাই। মগজ কাজ করে না এমন তো নয়! অথচ এ কেমন বুদ্ধি যে অনভিপ্রেত, রুক্ষ, কর্কশ, অলক্ষুনে, আখখুটে, নেতিবাচক শব্দগুলি ছেঁকে ছেঁকে তুলে নেয়!

কিন্তু শেখাতে না পারলে তো তাঁদের মান যায়, জাত যায়। কথাটা তাঁরা সর্বসমক্ষে স্বীকার করলেন না। বললেন, শিখছে শিখছে, বেশ শিখছে।

বড় বড় বই লিখলেন। থেকে থেকেই আলোচনাচক্র বসে। প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়। তার পর যে যার পছন্দের পাঠাগারে চলে যান। পড়েন, বোঝেন, বুদ্ধি দিয়ে, কল্পনা দিয়ে তৈরি করতে চেষ্টা করেন নতুন নতুন দর্শন, নতুন নতুন নীতি। করে টরে হৃষ্টমুখে এসে বসেন আবার, তর্ক হয়, প্রশ্ন ওঠে, জবাব আসে। বারো জন পণ্ডিত বারো রকম শাস্ত্র লেখেন। তাঁদের ছাত্ররা, শিষ্যরা এক একটা শাস্ত্র নিয়ে এক একটা মত এক একটা দর্শন তৈরি করে। তাতে নিজেদের ভাবনাচিন্তা, কল্পনা যোগ করে। কখনও ভুল ধরে আচার্যর, বদলায়, পুরো দর্শনটাই উল্টে যায়, পাল্টে যায়। বিশাল বিশাল পাঠাগার গড়ে ওঠে এই সব দর্শন, পুস্তক, পুঁথিপত্র নিয়ে। মনুষ্যজাতির বড় অহংকারের পাঠাগার।

লোকটিকেও পড়তে হয়। নিবিষ্ট হয়ে কেমন পড়ছে দ্যাখো। পণ্ডিতরা আশ্বস্ত হন। বুদ্ধির ভাষা, যুক্তির ভাষা, নীতির ভাষা, বুঝবে বইকী!

কিন্তু কিছুর মধ্যে কিছু না লোকটি এক দিন চোখ ঘুরিয়ে চতুর হেসে চিৎকার করে ওঠে, ক-য়ে কণ্ঠরোধ, খ-য়ে খচ্চর, গ-য়ে গর্জন, ঘ-য়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ....এই ভাবে চ-য়ে চৌর্য, ট-য়ে টাকা, ত-য়ে তাড়না, দ-য়ে দমন, প-য়ে পাপ, ব-য়ে বল, ম-য়ে ম্যাসাকার, শ-য়ে শ্শালা, হ-য়ে হত্যা হত্যা ওঃ আঃ হেঃ হিং টিং ছট টিং হিং ছট বলতে বলতে সে উন্মাদের মতো হেসে ওঠে। পণ্ডিতরা দূরে সরে যান। পরস্পরের দিকে তাকান। কী এমন ছিল তাঁদের শাস্ত্রে যে লোকটি এমন বিদঘুটে শিখল! নিজেদের মধ্যে গ্রন্থগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখেন, ছিঁড়ে কেটে তন্ন তন্ন করে, কী এমন আছে তাতে যে, লোকটির এমন উড়নচণ্ডে আচরণ! তবে হ্যাঁ, কিছু কালের মধ্যেই বারো পণ্ডিতের সেই বিশেষ ছাত্র শান্ত হয়ে গেল। তখন তাকে সাবধানে শেখানো হল অস্ত্রের ব্যবহার। কখনও পবনাস্ত্র, কখনও পাশ, কখনও পরিঘ, কখনও বা তরোয়াল। ঘুরে ঘুরে তাকে দেখানো হল— জীবন। দেখো হে.. চাষি ফসল ফলায়, কুমোর মাটি ছেনে বাসন, পুতুল গড়ে, প্রতিমা গড়ে, কামার কেমন ভস্ত্রা চালিয়ে আগুনে ধাতু পিটে পিটে তৈরি করে যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, তাঁতি বোনে কাপড়, ছুতোর গড়ে কাঠের জিনিস, খানিক ভূগর্ভের পর্বতগাত্রের রত্ন,

ধাতু, আদি সংগ্রহ করে, দেখো ওই সওদাগর এখানকার উৎপাদন নিয়ে ওখানে বেচে, ওখানকার উৎপাদন এখানে— এই ভাবে সম্পদ তৈরি হয়। এই ভাবে মানুষ সকালে জাগে, কাজ করে, পড়ে। শোনে, শেখে, বড় হয়, ঘরবসত করে, সন্তানপালন, বিদ্যাচর্চা, বিদ্যা বিতরণ। এই ভাবে জগৎ চলে, জীবন চলে। চলছে, চলবে। এই হল গিয়ে মৌলিক ছক জীবনের।

লোকটি দেখে এবং দেখে। চুপচাপ থাকে। শিক্ষকরা বোঝেন এত দিনে বুঝি ওষুধ ধরল। ওর মন বসছে। ও শিখছে। জীবনকে কাছ থেকে দেখল তো! এ বার শিখবে কাকে বলে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, কীসে উপকার কীসে অপকার, মঙ্গল-অমঙ্গল। জীবনযাত্রার মূল উপাদানগুলি কী! সুখ ও শান্তি কত জরুরি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কগুলিই বা কত যত্নে রক্ষা করার যোগ্য।

দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে পণ্ডিতেরা দেশান্তরে গেলেন। যে যার গ্রন্থ প্রচার করবেন, ছাত্র সংগ্রহ করবেন, তাঁদের আহৃত জ্ঞান ছড়িয়ে যাবে দিগ্‌বিদিকে। বহু দিন চলে গেছে তার পর। যে যার বিদ্যাচর্চার শেষে যার যখন ডাক এল, চলে গেলেন লোকান্তরে। মনে বড় সন্তোষ, তৃপ্তি। যেটুকু জীবন পেয়েছিলাম জ্ঞান, বুদ্ধি, মনন উজাড় করে বহু পরিশ্রমে এমন কিছু লিখে গেছি যাতে মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ, মানুষের মঙ্গল।

মগধের সঙ্গে অঙ্গ, বৎসর সঙ্গে কোশল, গান্ধারের সঙ্গে অবন্তীর নিরন্তর যুদ্ধ চলে। কুরুদের সঙ্গে পাঞ্চাল, অযোধ্যার সঙ্গে লঙ্কা, ট্রয়ের সঙ্গে গ্রিস, গ্রিসের সঙ্গে তুরস্ক, ইংল্যান্ডের সঙ্গে স্পেন, ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানি। অস্ত্রের ঝনঝনায় পৃথিবী ভরে যায়, মৃতদেহ পচে দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস বিষগ্রস্ত করে। এই সমস্তর উপর দাঁড়িয়ে ওঠে লোকটি। মাধ্বী পান করে। দশগুণ বলবৃদ্ধি হয় তার। তার রথের চাকায়, ঘোড়ার খুরের তলায়, হাতির তলায় গুঁড়িয়ে ছেঁচড়ে পিষে যায় কত শত রাজ্যের কত শত মানুষ, তাদের বৃত্তি, ঘর-বসত। একমাত্র যারা তার স্বেচ্ছাচারকে ভয় করে, কিংবা আত্মস্বার্থে সমর্থন করে, তারাই কোনও ক্রমে নিরাপদে থাকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জাল ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকের মগজের খবর তার কাছে কোনও না কোনও ভাবে পৌঁছে যায়। অনেক সময়ে মিথ্যে খবর। মিত্রেরও মুণ্ডু গড়ায়। গুপ্তহত্যায়-হত্যায় শেষ হয়ে যেতে থাকে মানুষ।

তখন সেই বিপন্ন মানবপুঞ্জের মাঝখানে এসে দাঁড়ান আর এক দল পণ্ডিত। ভাষণ দেন। বই লেখেন। আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে সে সব। দিকে দিকে মাথা তুলতে থাকে শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন, ভরসাহারা রাম, শ্যাম, যদু, মধু, টম, ডিক, হ্যারিগণ। শত শত তির বল্লম বিঁধে যায় লোকটির শরীরে— ধরাশায়ী হয় সে। নিহত স্বৈরাচারীর দেহ ঘিরে উল্লাসে মেতে ওঠে জগৎ। ধ্বংস হোক, নিপাত যাক ওই সাক্ষাৎ শমন। কী শান্তি, কী অপার শান্তির দিন সামনে এখন!

আলোচনা চলছে, আলোচনা-চক্র, দেশ-বিদেশ দিক-দিগন্তর আলোচনায় ভরে যায়। বই লেখা হচ্ছে। নিজেদের পরিবার, স্বাস্থ্য, স্বার্থ সমস্ত বাঁধা রেখে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন অকুতোভয় পণ্ডিতেরা। বেরোয় একটার পর একটা নীতি, সূত্র, গ্রন্থ। বিদ্যুতের মতো ঝিকিয়ে ওঠে দিকে দিকে। নতুন প্রাণ পেয়েছে সবাই। আর আমি নয়, আমরা। সবাই মিলে আমরা। আমরা সবাই যা স্থির করব— তাই-ই হবে। তাই হয়, তাই-ই।

পণ্ডিতেরা নতুন নতুন সূত্র গড়ে দিয়ে, সে সব যথাসাধ্য প্রচার করে। ছাত্রদল গড়ে তুললেন। বারো পণ্ডিতের বারো মত। প্রত্যেক মতের পথিকরাই সংখ্যায় অনেক, বিশ্বাসে স্থির, কেউ আবার নিজের আচার্যের মত খণ্ডন করলেন। উল্টে দিলেন, পাল্টে গেল। জ্ঞানের জগতে চুলচেরা তফাত সব। সেই নিয়ে পুরো পৃথিবীর বুধ-জন মেতে উঠলেন। এ এক প্রগাঢ় বিস্ময়ের, প্রেরণার উদ্দীপন। চলে গেলেন এঁরা দিকে দিকে। ভাষণ দিতে লাগলেন। ব্যাখ্যাপত্র, গবেষণাপত্র, পাহাড় হয়ে জমে উঠল।

তার পর সহসা এক দিন ক পণ্ডিত বললেন খ পণ্ডিতকে— ওহে, শুনতে পাচ্ছ?
কানের পেছনে হাতের পাতাটি ধরে নিবিষ্ট হয়ে শুনলেন খ— শুনছি, কিন্তু বুঝছি না।
গ শুনেটুনে বললেন— বুঝলেন না? আমার তো মনে হচ্ছে কান্না মানে ক্রন্দনরোল।
—কান্না? হতেই পারে। মানুষের কান্না কি আমরা এত করেও থামাতে পেরেছি? সম্পর্ক গড়ার কান্না, ভাঙার কান্না, অভাবের কান্না, ঝড় বন্যা খরা ভূমিকম্পের কান্না, বিচ্ছেদের যাতনা। মৃত্যুযন্ত্রণা.... কী করব..... কান্না থাকবেই।
ঘ মাথা নেড়ে বললেন— এগুলি থামাবার জন্যেও তো কত মন্দির, কত ধর্ম গড়লাম, কত বড় বড় মানুষ এলেন, গেলেন।

ঙ বড় ক্ষুব্ধ— করিনিটা কী? বিরূপ প্রকৃতিকে শায়েস্তা করার জন্য মন্ত্র-তন্ত্রও তো কম করলা
ম না। কত বিভূতি কত মন্ত্র নিয়ে গেল।
চ বললেন— চিকিৎসা, সেবা— কিছুই তো বাদ দিই নাই তা যদি বলো।

তখন ঠ ধীর গলায় বললেন— সে-কান্না নয়। ভাল করে শোনো। সম্পর্ক ভাঙাগড়ার কান্না এমন সশব্দ হয় না। অভাবের কান্নায়, রোগযাতনায় মানুষ গোঙায়, মৃত্যুবেদনায় শোকার্তের হাহাকার, সে অন্য রকম। আর প্রকৃতি-বিপর্যয়? তখন তো আর কান্না থাকে না। আত্মরক্ষার তাগিদ জেগে ওঠে, আপনপর, শত্রুমিত্র ভুলে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে বাঁচতে। যখন ভেসে যায়, চাপা পড়ে যায়, একটি আর্ত শ্বাস অন্তরীক্ষের দিকে উঠে যেতে শুনি শুধু সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস— ও-হ। আ্হ্! তার পর সব শেষ।

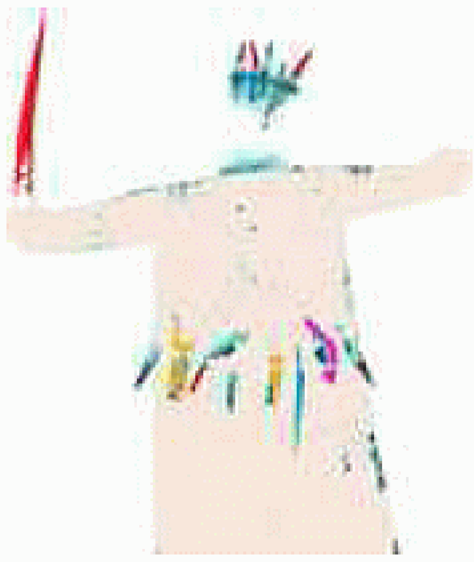

ক, খ, গ বললেন— ঠিক। এ কান্না যেন রাতের বেলা ডাকাত পড়েছে।
ঘ বললেন— এ বিপদের জন্য প্রস্তুতি ছিল না। বিশ্বাস করতে পারেনি।
ছ বললেন— এ যে দিশেহারা আতঙ্কের কান্না হে। যেন নিজের মনকে আততায়ীর বেশে দেখে ফেলেছে।
সববাই বললেন— দেখতে হচ্ছে।

শবদেহ ছড়িয়ে আছে দিকে দিকে। ছিন্ন ভিন্ন। জীর্ণ শীর্ণ মানুষের শব। সাবধানে পথ করে করে চলেন তাঁরা। কোথাও মানুষকে উল্টো করে ঝুলিয়ে, উপুড় করে, উলঙ্গ করে বেঁধে-বিধে বেধড়ক মার। লাঠি, গুলি, বোমা, অ্যাসিড, চপার, টাঙি। শিশুগুলিকে কারা চিরে দিয়ে গেল। মেয়েগুলিকে টেনে হিঁচরে, ধর্ষণ করে, যৌনাঙ্গে তরোয়াল ঢুকিয়ে....ওহ, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। পৃথিবীময় বর্ণনাতীত বীভৎস নির্যাতন।

—বাঃ। তাঁরা কেঁপে ওঠেন— আমরা তো সে লোকটাকে কবেই মেরে ফেলেছি। সারা পৃথিবীতে এখন তো এই কিষান, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর, এই কর্মচারী, শ্রমিক, খনিক, বৈজ্ঞানিক, বাস্তুকার, প্রয়োগবিদ— এরাই তো, এঁরাই তো এখন সর্বসম্মত। তা হলে?
ক হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন— ওই দ্যাখো।

বিস্ফারিত চোখে ওঁরা দেখলেন মরা মানুষের জাঙাল ভেদ করে উঠে আসছে একটা আকার, যতই উঠে আসে, ততই তাকে চিনতে চিনতে চিত্রার্পিত হয়ে যান সব। উঠে আসছে সেই লোকটা বহু যুগ আগে যাকে মেরে ফেলা হয়ে গেছে, গ্রন্থে গ্রন্থে যার হনন-বার্তা এক দিন মহার বে চতুর্দিকে রটিত হয়েছিল। স্বর্গে এবং মর্ত্যে, লোকান্তরে এবং লোকায়তে বিধবস্ত পণ্ডিত শিল্পী সংবেদীরা আর্তনাদ করেন— এ কী হল ঈশ্বর, এ কেমন জিনিস দিলে তুমি, এ কী ভয়ানক অঘটন!

বিদ্যুৎ চমকে যায়, প্রকম্পিত ঝলকিত হতে থাকে ভূমি। বেতবনের আড়ালে অধূমক অগ্নি জ্বলে। আকাশে মেঘডম্বর। বজ্রপাত হয় ভীষণ শব্দে। অগ্নিরূপ মেঘকণ্ঠ বলে ওঠে— ভেবে দ্যাখো হে মানুষ, আমি নয়। মাটি গড়ে থাকতে পারি, এবং আকাশ, এবং জল ও বাতাস। কিন্তু ওকে গড়েছ তোমরা। যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না, যার হৃদয় নেই, মগজে খালি হিংসা আর দম্ভ, ওই সেই রাষ্ট্র— তোমাদের গড়া, তোমাদের দায়। তোমরা, তোমরা, আমি না, আমি না....।

প্রতিধ্বনি দশ দিক থেকে ফিরে এসে বলে যায়— না, না, না, না।